শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

সারা পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত 'The Gospel of Sri Ramakrishna' নামে পরিচিত। গসপেলের অর্থ সুসংবাদ। এই সুসংবাদই মানবমনকে ঊর্ধ্বে টেনে তোলে। আজ নিত্য কথামৃত পড়েন বহু মানুষ। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবনকথা ও অপূর্ব উপদেশ পড়ে ও শুনে অপার্থিব আনন্দ পান। কিন্তু খুব কম মানুষই কথামৃতকার ও কথামৃত গ্রন্থের ইতিহাস সম্পর্কে জানেন। এই গ্রন্থের পটভূমি, পরিবেশ ও লেখকের রচনার অপূর্ব কাহিনি পরিবেশন করার চেষ্টা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

শ্রীরামকৃষ্ণের গসপেল পাঁচখানি

বিভিন্ন লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যদিও শিক্ষাগুলি মূলত এক, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন শ্রোতাদের কাছে বিভিন্ন শব্দ ও ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও কাহিনিগুলি কেউ বিশদভাবে কেউ বা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাইবেলেও আমরা একই ব্যাপার লক্ষ করি। যিশুর একই উপদেশ বা তাঁর সম্বন্ধে কাহিনি বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ম্যাথিউ, মার্ক, লুক ও জন। প্রতিটি উপদেশের শব্দ ও ভাষা ভিন্ন এবং কাহিনিগুলি কোথাও বিস্তৃতভাবে, কোথাও সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই একই বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেন।

পাঁচজন লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত নিজেদের শ্রবণ ও মনন অনুযায়ী লিখেছেন। ১৮৭৮ সালে গিরিশচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্য, 'আদি কথামৃত' নামে শ্রীরামকৃষ্ণের একশো চুরাশিটি উপদেশ প্রকাশ করেন। ১৮৮৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের উপদেশ' নামে নশো পঞ্চাশটি উপদেশ প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত তিনশোটি উপদেশ 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামে একটি গ্রন্থে ছাপান। শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত তাঁর ডায়েরিতে ঠাকুরের কথামৃত লিপিবদ্ধ করেন। এ থেকে ১৯০২ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এগুলিতে একশো সাতাত্তর দিনের বিবরণী সংরক্ষিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ পঞ্চম কথামৃত রচনা করেন, যা ১৮৯৮ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯০৫-এ ঠাকুরের দুশো আটচল্লিশটি উপদেশ একত্রিত করে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এই পাঁচখানি কথামৃত শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাষা বাংলাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথম তিনখানির সম্পূর্ণভাবে ইংরেজিতে অনুবাদ হয়নি। ১৯৪২ সালে স্বামী নিখিলানন্দ শ্রীম-র রচিত পাঁচ খণ্ড কথামৃত একত্রে কালক্রমানুসারে ইংরেজিতে 'The Gospel of Sri Ramakrishna' নামে অনুবাদ করেন। অলডাস হাক্সলি তার ভূমিকা লেখেন। ১৯২৪ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের রচিত কথামৃত ইংরেজিতে অনূদিত হয়; জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও এফ জে আলেকজান্ডার সেটি সম্পাদনা করেন। এটি 'Words of the Master' নামে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

স্বামী শিবানন্দ বলেন, ''ঠাকুরের কথা সব এত ভাল লাগত যে আমিও একটু একটু লিখে রাখতে আরম্ভ করেছিলুম। একদিন তো দক্ষিণেশ্বরে নিবিষ্ট মনে বসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনছি—খুব সুন্দর সুন্দর কথা হচ্ছিল। তিনি আমার ঐ ভাব লক্ষ্য করে হঠাৎ বললেন, 'কিরে অমন করে কি শুনছিস?' আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে গেলুম। তাতে ঠাকুর বললেন, 'তোর ওসব কিছু করতে হবে না—তোদের জীবন আলাদা।' আমার মনে হয় ঠাকুর যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই ঐভাবে বললেন। সেই থেকে আমিও কিছু লিখে রাখার সংকল্প ত্যাগ করলুম। যা লিখেছিলুম তাও পরে গঙ্গার জলে সব ফেলে দিই।''[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যুবক শিষ্যদের অন্তর ও বাইরে উভয়তই ত্যাগ করতে বলতেন, আর গৃহী ভক্তদের ত্যাগ করতে উপদেশ দিতেন মনের দিক থেকে। ঠাকুর কীভাবে তাঁর ত্যাগী শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন সে-সম্পর্কে স্বামী প্রেমানন্দ বলেন, ''কথামৃতে কটা কথাই বা ঠাকুরের আছে। মাস্টারমশাই তাঁর বইয়ে এক কথাই অনেকবার লিখেছেন। তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে যেতেন। যা শুনে আসতেন তাই নোট (লিখে) রাখতেন। ঠাকুর গৃহী বা ত্যাগী যেমন শ্রোতা দেখতেন, সেইরকম উপদেশ দিতেন। তিনি কারও ভাব নষ্ট করতেন না। যার যা পেটে সয় সেইরকম উপদেশ দিতেন। গৃহীদের একরকম, ত্যাগীদের অন্যরকম। তাঁর ঘরে যখন কোনও গৃহী ভক্ত না থাকত, তখন দরজা বন্ধ করে, তিনি আমাদের ত্যাগ বৈরাগ্যের জ্বলন্ত উপদেশ দিতেন। আবার মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে দেখতেন, কোনও সংসারী লোক আসছে কি না। কামিনীতে, সংসারে যাতে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মে, সেই সব কথা উপমা দিয়ে বলতেন, যাতে আমাদের প্রাণে বিঁধে যায়।''[২]

কথামৃতের উৎস

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের উৎস শ্রীম-র ডায়েরি। এখানে তিনি লিপিবদ্ধ করেন বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি ও কথোপকথন, এবং তাঁর শিষ্যদের সংবাদ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ থেকে ১০ মে ১৮৮৭ পর্যন্ত। ঠাকুরের তিরোধানের দুবছর পর থেকে শ্রীম ডায়েরির সংক্ষিপ্ত লিপিগুলি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু সব বিবরণ তিনি প্রকাশ করে যেতে পারেননি। ১৮৮৮ সালের ১১ জুলাই বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কথামৃতের একটি অধ্যায় পাঠ করে শোনান। ওই পাণ্ডুলিপির পাঠ শুনে শ্রীমা তাঁকে আরও লিখতে উৎসাহ দেন। ১৫ মার্চ ১৮৯০ শ্রীম মায়ের কাছে আর একটি অধ্যায় পাঠ করেন এবং তা প্রকাশের অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভ করেন।

১৮৯২ সালে 'পরমহংসদেবের উক্তি—তৃতীয় ভাগ' নামে কুড়ি পৃষ্ঠা ব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা ছিল : ''সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন দ্বারা প্রকাশিত এবং সাধু মহীন্দ্রনাথ গুপ্তের কৃপায় ইহা সংগৃহীত হইল।'' মনে হয় ছদ্মনামী শ্রীম কর্তৃক পরমহংসদেবের উক্তি—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পূর্বে বেরিয়েছিল। সম্ভবত পুস্তিকাটির প্রথম ও

দ্বিতীয় ভাগ পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ আঁটপুর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯ শ্রীমকে লেখেন, ''মাস্টার মহাশয়, আমি আপনাকে লক্ষ লক্ষ বার ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরেছেন। হায়, অতি অল্পলোকেই তাঁকে বুঝতে পেরেছে! যে-উপদেশামৃত ভবিষ্যতে জগতে শান্তি বর্ষণ করবে, কোনও ব্যক্তিকে যখন তার ভিতর সম্পূর্ণ ডুবে থাকতে দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করতে থাকে এবং আমি যে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হয়ে যাই না কেন—তাই আশ্চর্য!''

সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় ডায়েরির বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখে প্রকাশ করতে পারেননি শ্রীম। যা হোক, ২৬ নভেম্বর ১৮৯৫ সারদা দেবী কামারপুকুর থেকে শ্রীমকে লেখেন, ''যে বিষয়গুলি অর্থাৎ ঠাকুরের যে কথাগুলি বলিবার জন্য বাছিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া বাছিয়া রাখিবেন।'' এই আদেশ পালন করেই শ্রীম ১৮৯৭ সালে দুই খণ্ডে ইংরেজিতে কথামৃত (গসপেল) প্রকাশ করেন পুস্তিকাকারে।

শ্রীমায়ের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীম ধারাবাহিকভাবে ইংরেজিতে ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় 'Leaves from the Gospel of the Lord Sri Ramakrishna' প্রকাশ করতে থাকেন। স্বামীজী প্রথম সংখ্যাটি পড়ে ১১ অক্টোবর ১৮৯৭ রাওয়ালপিন্ডি থেকে শ্রীমকে লেখেন : ''তোফা হয়েছে বন্ধু, তোফা। এতদিনে আপনি ঠিক কাজে হাত দিয়েছেন। গর্ত থেকে বেরিয়ে আসুন বন্ধু! সারাজীবন ঘুমিয়ে কাটাবার নয়। সময় বয়ে যাচ্ছে। সাবাস। ওই তো কাজ।

''পুস্তিকা প্রকাশের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। কেবল ভয় হয়, পুস্তিকাকারে প্রকাশ করলে খরচে পোষাবে না। কুছ পরোয়া নেই—টাকা হোক বা না হোক—দিবালোকে তা বেরিয়ে আসুক। আশীর্বাদ পাবেন অনেকের, বেশিলোকের কাছ থেকে অভিশাপ। কিন্তু বৈসাহি সদ কাল বনতা সাহেব। এই হল সময়!''

তারপর স্বামীজী যখন দেরাদুনে তখন দ্বিতীয় খণ্ডটি পান। তিনি ২৪ নভেম্বর ১৮৯৭ শ্রীমকে আবার লেখেন : ''দ্বিতীয় পুস্তিকাটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাস্তবিকই অপূর্ব। প্রচেষ্টা একেবারে মৌলিক। ইতিপূর্বে কখনও কোনও মহান আচার্যের জীবনকে লেখকের মনের রং না ছড়িয়ে এইভাবে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা হয়নি—যা আপনি করলেন। ভাষাও প্রশংসার অতীত—এমন সজীব, তীক্ষ্ণ, প্রত্যক্ষ অথচ এমন সহজ স্বচ্ছন্দ। কতখানি যে উপভোগ করেছি বলে বোঝাবার ভাষা নেই। পড়ে একেবারে মাতোয়ারা। কী অদ্ভুত! আমাদের আচার্য, আমাদের প্রভু, ও-হেন মৌলিক, আমাদের সকলকেও তাই মৌলিক হতে হবে, নচেৎ সব বরবাদ। এখন বুঝতে পারছি, আমাদের মধ্যে আর কেউ কেন আগে তাঁর জীবনী লেখার চেষ্টা করেনি। ও-কাজটা—ওই বিরাট কাজটা—আপনার জন্যই তোলা ছিল। স্পষ্টতই তিনি আপনার সঙ্গে আছেন।...

''সক্রেটিসের সংলাপের আগাগোড়াই প্লেটো। আর আপনি আছেন সম্পূর্ণ অন্তরালে। তদুপরি নাটকীয় অংশ অসাধারণ সুন্দর।''

দুই খণ্ডে পুস্তিকা আকারে 'গসপেল' প্রকাশিত হওয়ার পর চারিদিক থেকে শ্রীমর উপর প্রশংসা বর্ষিত হতে থাকে। এরপরই যোগোদ্যান থেকে প্রকাশিত 'তত্ত্বমঞ্জরী'তে (অগ্রহায়ণ ১৩০৪) রামচন্দ্র দত্ত নিজের মন্তব্য প্রকাশ করলেন :

''শ্রদ্ধাস্পদ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত... প্রভুর প্রতি তাঁহার যেরূপ বিশ্বাস, সেরূপ বিশ্বাসের পরিচয় স্বরূপ প্রভুর উক্তিগুলি মনুষ্যশক্তি সঙ্গত চেষ্টায় সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেছেন... গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ, এই উপদেশগুলি খণ্ডাকারে বাহির না

করিয়া একেবারে বৃহদাকারে মুদ্রিত করিলে সাধারণের বিশেষ কল্যাণ হইবে। দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে তিনি বাংলা ভাষা পরিত্যাগ করিলেন কেন? গভীর ভাবপূর্ণ তত্ত্ব কথা ইংরাজীতে তর্জমা করিতে অনেক স্থলে ভাবান্তর হয়, তাহা তাঁহাকে বলিবার আবশ্যকতা নাই। এ দেশের সর্বসাধারণের পক্ষে তাহা দুর্বোধ্য হইয়া উঠিবে।"[৩]

শ্রীম 'তত্ত্বমঞ্জরী'র সমালোচনা স্বীকার করে বাংলাতে কথামৃত লিখতে শুরু করলেন। যা হোক, তাঁর গসপেলের ইংরেজি পুস্তিকাগুলি অবাঙালি পাঠকমহলে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। ঠাকুরের উপদেশগুলি সহজ, সরল, মর্মস্পর্শী ও অনুপ্রেরণাদায়ক।

শ্রীমর ডায়েরি থেকে যখন কথামৃত ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হতে শুরু করল, শ্রীমা তাঁকে আশীর্বাদি চিঠি লেখেন (৪ জুলাই ১৮৯৭), ''বাবাজীবন,

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে ওই সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ওই সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। আমি একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ওই সমস্ত কথা বলিতেছেন।

জয়রামবাটী, ২১ শে আষাঢ়, ১৩০৪"[৪]

পরবর্তী কালে শ্রীমা তাঁর সেবকদের কথামৃত পড়ে তাঁকে শোনাতে বলতেন। একদিন পাঠের পর মা বললেন, ''মাস্টার কি সুন্দরভাবে সব মনে করে লিখেছে! শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ সামনে সব কথা হচ্ছে। কি বর্ণনা! আর এসব কথা যেন হৃদয়ে গেঁথে থাকে। এই সমস্ত পড়ে-শুনেই তো আজকাল এতলোক তাঁর (ঠাকুরের) দিকে ঝুঁকেছে। শান্তি পাচ্ছে। এসব অমোঘ কথা।"[৫]

শ্রীমায়ের আদেশ ও অনুপ্রেরণা পেয়ে শ্রীম বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কথামৃতের বিভিন্ন অধ্যায় ছাপতে শুরু করেন। পত্রিকাগুলির নাম— অনুসন্ধান, আরতি, আলোচনা, উৎসাহ, উদ্বোধন, ঋষি, জন্মভূমি, তত্ত্বমঞ্জরী, পুণ্য, প্রদীপ, প্রবাসী, প্রয়াস, বামাবোধিনী, সাহিত্য, সাহিত্য-সংহিতা, হিন্দুপত্রিকা ইত্যাদি। তারপর শ্রীম এই অধ্যায়গুলি কালক্রমানুযায়ী সাজিয়ে ১১ মার্চ ১৯০২ উদ্বোধন প্রেস থেকে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের তত্ত্বাবধানে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। এরপর কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে; তৃতীয় ভাগ ১৯০৮ সালে; চতুর্থ ভাগ ১৯১০ সালে এবং পঞ্চম ভাগ ১৯৩২ সালে। সমগ্র পাঁচখণ্ড কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালের একশো সাতাত্তর দিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং আট দিনের বিবরণ (বরানগর মঠ) লেখা হয়েছে তাঁর তিরোধানের পর। অধিকন্তু শ্রীম কিছু বাড়তি উপাদান সংগ্রহ করে কথামৃতের বিভিন্ন খণ্ডের পরিশিষ্টে সংযোজন করেছেন।

শ্রীম কীভাবে ডায়েরির সংক্ষিপ্ত শব্দগুলি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বিস্তার করতেন তার নমুনা স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দিয়েছেন। রবিবার, ১ জানুয়ারি ১৮৮২ সাল। ঠাকুর কলকাতার সিমলাতে জ্ঞান চৌধুরীর বাড়িতে ব্রাহ্মোৎসবে যোগদান করেন। ডায়েরিতে লেখা আছে : ''মন বন্ধক দিয়াছ'', ''ভাঁড় একক ও গঙ্গাজলের জালায়'', ''কামারশালের লৌহ মাঝে মাঝে হাপরে'', ''অহং যায় না e [example] কাটা ছাগল''; পাকা আমি e.g. তরবারী ও পরশমণি'' ইত্যাদি।[৬] এইসব সামান্য শব্দ থেকে শ্রীম ধ্যানের দ্বারা সম্প্রসারণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিম্নোক্ত অতগুলি কথা :

''শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তা সংসারে হবে না

কেন? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে তবে তো ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক দিয়েছ; কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক! তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার।

''মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন-ভজন হবে। সর্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। হয় নির্জনে রাতদিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধুসঙ্গ। মন একলা থাকলে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়।

''এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে! কিন্তু গঙ্গাজলের ভিতর যদি ওই ভাঁড় ডুবিয়ে রাখো, তাহলে শুকবে না!

''কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে গেল। আবার আলাদা করে রাখো, যেমন কালো লোহা, তেমনি কালো। তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয়।

''আমি কর্তা, আমি করছি তবে সংসার চলছে; আমার গৃহ পরিজন—এ সকল অজ্ঞান! আমি তাঁর দাস, তাঁর ভক্ত, তাঁর সন্তান—এ খুব ভাল।

''একেবারে আমি যায় না। এই বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছ, আবার কাটা ছাগল যেমন একটু ভ্যা ভ্যা করে হাত পা নাড়ে, সেই রকম কোথা থেকে আমি এসে পড়ে।

''তাঁকে দর্শন করবার পর, তিনি যে আমি রেখে দেন, তাকে বলে পাকা আমি।

''যেমন তরবার পরশমণি ছুঁয়েছে, সোনা হয়ে গিয়েছে। তার দ্বারা আর হিংসার কাজ হয় না!''[৭]

প্রত্যক্ষদর্শী নিত্যাত্মানন্দ লিখেছেন : ''মনে হয়, এই অদ্ভুত মহাপুরুষটিকে দৈবী মেধা ও স্মৃতিশক্তি দিয়ে... ঠাকুর... এনেছেন। এ যেন ফটোগ্রাফের স্লাইড। যা শুনেছেন তাই মস্তিষ্কে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। আরও মনে হচ্ছে, শ্রীম কথামৃত লেখার সময় ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন মনে। সেই শুদ্ধ সমাহিত মনে যা উদয় হচ্ছে তাই লিখছেন পূর্বে রক্ষিত নোট অবলম্বন করে।''[৮]

শ্রীম যেখানে যেতেন সেখানেই কথামৃত পাঠ ও আলোচনা হত। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ শ্রীম ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে যান। কথামৃত পাঠের পর এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, ''মাস্টার, শ্রীম ও মণি যদি এক তবে তিনটি পৃথক না হয়ে একটা হল না কেন?''

শ্রীম উত্তর দেন, ''যেখানে গুহ্য কথা সেখানে মণি দেওয়া হয়েছে। অন্যের তো personality জানবার দরকার নেই। কি বলছেন জানলেই হল। হয় তো তিরস্কার বা প্রশংসা করছেন, অন্যের তা জানবার কি প্রয়োজন?''

ভক্ত : আপনার ডায়েরি ছাপা হলে অন্যে বুঝবে কি?

শ্রীম : না, খুব সংক্ষেপে লেখা আছে। কিছু মনে, কিছু নোট। বইতে যেমন—ব্রহ্মচারী ও সাপ।''[৯]

একবার স্বামী বীরেশ্বরানন্দ শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করেন (১৬ জুলাই ১৯২৫), ''আপনি কি করে এই সামান্য একটা স্কেচ থেকে এই বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর 'কথামৃত' রচনা করলেন?''

শ্রীম : ''তাঁর কৃপায়। লোক দেখে ত্রিশ বছরের ঘটনা। কিন্তু আমি দেখছি আমার চোখের সামনে ঘটছে এই ক্ষণে। সময়ের ব্যবধান দূর হয়ে যায় ধ্যানে। ভক্তিতে সব বর্তমান—অতীত, ভবিষ্যৎ নেই।''[১০]

গদাধর আশ্রমে জনৈক ভক্ত একদিন (৩ নভেম্বর ১৯২৭) শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করেন, ''ঠাকুর নাকি আপনাকে ছাড়া অপর যারা তাঁর কথা লিখছিলেন তাদের বারণ করেছিলেন?''

শ্রীম : ''যারা তাঁর সামনে কিছু লিখবার চেষ্টা করত তাদের বারণ করেছেন। আমি যে লিখতুম তা কেউ জানত না। ডায়েরি লেখা 4th class-এ পড়ার সময় থেকে অভ্যাস। তার এগারো বছর পরে ঠাকুরের দর্শন, সঙ্গলাভ। অভ্যাসমতই তাঁর

কথা লিখে রাখতুম। ঠাকুর যখন কাশীপুর বাগানে অসুস্থ তখন ডায়েরি লেখার বিষয় অপরের কাছে জানতে পেরেছিলেন, আমায় কিন্তু বারণ করেননি।"[১১]

দিনের পর দিন ঠাকুরের সেইসব অপূর্ব কথা একমনে শুনে ভিতরে ধরে রাখতে এবং সেগুলি ডায়েরিতে লিখে রাখতে দীর্ঘ সময় লাগত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিদ্রাহীন হয়ে ডায়েরির লেখা শেষ করতে মাথায় ও স্নায়ুতে খুব চাপ পড়ত। বুক ধড়ফড় করত। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ শ্রীম বলেন : ''একদিন বাদুড়বাগানে রাস্তায় বসে পড়েছিলাম অজ্ঞান হয়ে, বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ির সামনে। তারপর একজন গাড়ী করে বাড়ি পৌঁছে দিল।... ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, 'ঘুমোও আর দুধ খাও। আর কিছু দিন লেখা বন্ধ কর।' "[১২] *(ক্রমশ)*

তথ্যসূত্র

১। সম্পাদক : স্বামী চেতনানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯৯), পৃঃ ১০০

২। স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ, *স্বামী প্রেমানন্দ* (শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মন্দির : দেওঘর, ১৩৫৩), ২।২৭-২৮

৩। *শ্রীমর জীবনদর্শন* (জগবন্ধু প্রকাশন : কলকাতা, ১৯৯০), পৃঃ ৩৪৪

৪। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), অখণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ পাঁচ [এরপর, *কথামৃত*]

৫। *মাতৃসান্নিধ্যে* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), *পৃঃ* ১০১

৬। *শ্রীমর জীবনদর্শন*, পৃঃ ৩৮৬

৭। *কথামৃত*, পৃঃ ১১১২-১৩

৮। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, *শ্রীম-দর্শন* (শ্রীম ট্রাস্ট : চণ্ডীগড়, ২০০৯), ১৫।৩৬৪

৯। সম্পাদক স্বামী অসিতানন্দ, *সারদা পত্রিকা* (শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মঠ : ভট্টনগর, হাওড়া), ৪।১৩৫

১০। *শ্রীম-দর্শন*, ১৩। ৮৭ (২০০৯)

১১। *সারদা পত্রিকা*, ৬। ৮

১২। *শ্রীম-দর্শন*, ৯।১৭৬ (২০০৬)

স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ

ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে * সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

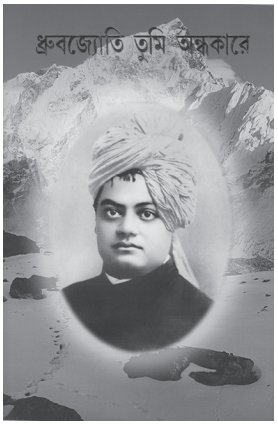

জ্ঞানীগুণী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, গবেষক ও সুলেখকবৃন্দের মননঋদ্ধ রচনায় এ-গ্রন্থ রূপ পরিগ্রহ করেছে। কলম ধরেছেন পরমপূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী চেতনানন্দ, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা, সুব্রতা সেন, স্বরাজ মজুমদার, দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, পূর্বা সেনগুপ্ত প্রমুখ। আছে প্রয়াত চিন্তাবিদ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অমিয়কুমার মজুমদারের দুটি অনবদ্য সুচিন্তিত রচনার বঙ্গানুবাদ। সঙ্গে আর্টপেপারে স্বামীজীর দশটি রঙিন ছবি। **পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৬৮, মূল্য ২৮০ টাকা।**

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ এবং শাখাকেন্দ্রসমূহ, উদ্বোধন কার্যালয়, বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক), যোগোদ্যান (কাঁকুড়গাছি), নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, অদ্বৈত আশ্রম।